সন্ত্রাসী আইন

সুজাত ভদ্র

গত বছর নভেম্বর মাসে মুম্বাই-এ ''সন্ত্রাসবাদী''আক্রমণের একমাসের মধ্যেই , কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত দুটি ''সন্ত্রাস-বিরোধী'' বিল অস্বাভাবিক দ্রুততায় লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেছে , রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও পেয়ে গেছে । ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের রাজনৈতিক সমাজ ''জরুরি পরিস্থিতি''-র অজুহাতে ভারতের আমজনতার নিরাপত্তা ''সুরক্ষিত করার কারণে'' আন্তর্জাতিক স্তরে এবং দেশের সংবিধানে স্বীকৃত , গ্যারান্টিযুক্ত বহু অমূল্য অধিকার ছিনিয়ে নিল । কোনো একটি বা একাধিক আন্দোলিত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার সুযোগকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র/সরকার-রাজনৈতিক সমাজ-গণমাধ্যম ব্যতিক্রমী অপরাধের জন্য ব্যতিক্রমী আইন প্রণয়নের , বা বলা হয় আইনী হিংসাকে মেনে নেওয়ার দাবি তোলে ।

আমাদের এরা ভাবাতে চেষ্টা করে , ব্যতিক্রমী আইনগুলো আমাদের মতো আমজনতাকেই নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য । আমাদের ভাবনাটা তাই এরকম হয়ে দাঁড়ায় --- নিরাপত্তা ও নাগরিক/মানবিক অধিকারের সুরক্ষা ——— এদুটোর একটা না ছাড়লে আরেকটা রক্ষা পাবে না ।

আমাদের অনুরোধ , আসুন , আমরা একটু দাঁড়াই । পেছনের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাব : ব্যতিক্রমী আইনের জাঁতাকলে নাগরিকদের উপর নির্যাতনের এক স্তরান্বিত অধ্যায় । ১৯৯৪ সালের ২৪ শে আগস্ট তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেশ পাইলট সংসদে বলেন , টাডা আইনে ধৃত ৬৭ হাজারের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার মানুষ নির্দোষ ছিলেন । যে ৭ হাজারের বিরুদ্ধে বিচার চলে , তাঁদের মধ্যে ৭২৫ জনকে দোষী প্রমাণিত করা গেছিল । দু-বছর ধরে চালু থাকা পোটা আইনে ২৬৩টি মামলাতে ধৃত ১৫২৯ জনের মধ্যে ১০০৬ জনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগের কোনো তথ্যই ছিল না ।

এই টাডা , পোটার অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবকটি অগণতান্ত্রিক, বিশ্বজুড়ে মানবধিকারের বিপরীতমুখী ধারাগুলো ১৯৬৭ সালে ভারতে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত আপাত-নিরীহ বেআইনী কার্যকলাপ (নিরোধক) আইনের (ইউ এ পি এ) সংশোধনী হয়ে প্রথমে ২০০৪ সালে এবং পরে ২০০৮ সালে স্থায়ী রূপ নিল । পাশাপাশি , আরেকটি নতুন আইন জাতীয় তদন্ত সংস্থা স্থাপন,

২০০৮-এর ''বিশেষ আদালত'' সংক্রান্ত অধ্যায়টি পুরোপুরিভাবে পোটার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর পুনর্মুদ্রণ ।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় , এবারের দুটি আইনের , বিশেষ করে ইউ এ পি এ-র প্রস্তাবনায় আইন প্রণয়নের মূল কারণ হিসাবেই ''আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের'' ৪ বিষয়টি রয়েছে , যা ২০০১ সালে আমেরিকার ৯/১১-র ঘটনার পরে প্রণীত টাডা বা পোটার প্রস্তাবনায় ছিল না । অথচ ২০০৮ সালের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আমেরিকার ''সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে (অন্তহীন) যুদ্ধ''-এর তত্ত্ব যখন বিশ্বজুড়ে ধিক্কৃত , তখন ভারত সরকার এই আইনদুটি পাশ করেছে ।

তাছাড়া , আমরা সবাই জানি ''সন্ত্রাসবাদের'' সংজ্ঞা আজও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি । ২০০৪ ও ২০০৮ সালের সংশোধনীতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ছাড়া ''সন্ত্রাসবাদী গ্যাং'' নামে একটি শব্দ আছে , যারে অর্থ তালিকাভুক্ত সংগঠন ব্যতিরেকে যে কোনো সংগঠন , ''যেটি সন্ত্রাসবাদী কোনও কাজে লিপ্ত বা এ ধরনের কোনও কাজের জন্য তৈরি'' , মানে , সরকারের অপছন্দের যে কোনো সামাজিক আন্দোলনকে এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত করা যেতে পারে ।

সংশোধনীতে বলা আছে , যদি কোনো ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য প্ররোচিত করেন ইত্যাদি তাহলে তাকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হবে । এই ধারায় ''সাহায্য করার উদ্দেশ্য'' নির্ধারণে পুলিশের মনোগত ধারণাই যথেষ্ট । আর আমরা আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় জানি পুলিশ কিভাবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ''উর্দিপরা সমাজবিরোধী'' হয়ে ওঠে ।

শুধুমাত্র অপপ্রয়োগের আশঙ্কাতেই এই আইনের বিরোধিতা নয় --- আমাদের বিরোধিতা মুলত ঃ নীতিগত । এই ''সন্ত্রাসবিরোধী'' আইন দুটি ন্যায়বিচার পাওয়ার ন্যুনতম শর্তগুলো থেকে ''সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী''বলে ধৃত নাগরিককে বঞ্চিত করবে ।

ভারতে প্রচলিত ফৌজদারি আইন অনুযায়ী , ৯০ দিনের মধ্যে বন্দী জামিন না পেলেও পুলিশ চার্জশিট দিতে না পারলে , বন্দী ৯১ দিনের মাথায় স্বাভাবিকভাবেই জামিন পাবেন । ইউ এ পি এ , ২০০৮ সাংশোধনীতে বলা হল—৯০ দিনের পরেও চার্জশিট দিতে না পারলেও , বন্দীকে ১৮০ দিন বন্দী করে রাখা যাবে । এছাড়া ''তদন্তের স্বার্থে'' বন্দীকে জেল হেফাজত

থেকে পুলিশ যে কোন সময়ে পুলিশ হেফাজতে টানা নির্যাতনের পরেও ১৫০দিন ধরে নিয়মিত ব্যবধানে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হবে বন্দীকে ।

এই ১৮০ দিন বিনা বিচারে থাকার পরেও বিশেষ আদালত ব্যক্তিগত বন্ডে বন্দীকে জামিন দেবে না --- সরকারি আইনজীবীর মতামত সাপেক্ষে বন্দী জামিন পেতে পারে । অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিচারে মুক্তি না পেলে , বন্দীকে বছরের পর বছর জেলে পচতে হবে ।

এছাড়া এই আইন অনুযায়ী , যদি কোনো যুগ্মসচিব পদমর্যাদার আমলার --- রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের --- এমন মনে করার কারণ থাকে , তবে যে কোনো তথ্য প্রমাণের জন্য যে কোনো সময়ে , যে কোনো স্থানে বা যে কোনো নাগরিকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো যেতে পারে , অর্থাৎ আমলার মনোগত ধারণাই একজন নাগরিকের প্রাইভেসি ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট হবে ।

রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সনদের (আই সি সি পি আর) ১৪নং অনুচ্ছেদ-এ রয়েছে বন্দীর অন্যতম অলঙ্ঘনীয় অধিকার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার । কিন্তু ইউ এ পি এ সংশোধনীতে বলা হয়েছে , যদি কোনো অস্ত্র বা বিস্ফোরক ইত্যাদি কোনো ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায় , তাহলে ধরে নেওয়া হবে সে/তারা সন্ত্রাসবাদী কাজ করতে যাচ্ছিল এবং সেই ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে নিজেকে/নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে । এবার জাতীয় তদন্ত সংস্থা আইন অনুযায়ী বিচার হবে গোপনে ------ প্রয়োজনে সাক্ষীদের নাম-ধাম-পরিচয় জানানো হবে না । অর্থাৎ যেন-তেন প্রকারেণ ''দোষী'' প্রমাণ করার সব ধরণের ব্যবস্থা করে হল আইন দুটিতে ।

টাডা-পোটার অনুকরণেই রচিত সংশোধনীতে আছে, ''সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ'' সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তদন্তকারী অফিসারকে জানাতে হবে । আর যদি তদন্তকারী সংস্থার মনে হয় , কোনো ব্যক্তি/সংগঠন জেনেশুনে এ তথ্য গোপন করছে , তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে । অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকরা প্রকারান্তরে হয়ে গেল সংবাদদাতা/গুপ্তচর ।

সর্বোপরি পোটায় অন্ততপক্ষে পুলিশের ''আক্রোশজনিত কাজ''-এর বিরুদ্ধে সাজা ও ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত ছিল । সংশোধনীতে সে ধরনের কোন বিধান রাখা হয়নি ।

সাম্প্রতিককালে এ রাজ্যে ইউ এ পি এ আইনের চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখা গেছে লালগড়ের জনসাধারণের কমিটির মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতোর ক্ষেত্রে । রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছত্রধরের সঙ্গে মাওবাদীদের যোগসাজশের অভিযোগ করা হচ্ছে । কিন্তু কোনো সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার পরেই একমাত্র সেই সংগঠনের সদস্য/সমর্থকদের ক্ষেত্রে এই আইনের পূর্ণ কার্যকারিতা থাকতে পারে । কিন্তু সংগঠনটি নিষিদ্ধ হওয়ার আগে কোনো যোগাযোগ থেকে থাকলে ছত্রধর মাহাতোর ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো কার্যকারিতা থাকে কি ? একই কথা প্রযোজ্য এই আইনে ধৃত মাওবাদীদের মুখপাত্র গৌর চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে ।

এছাড়া এই আইনে রিভিউ কমিটিতে অভিযুক্তর আবেদনের অধিকার থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা জানি না সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে । অর্থাৎ এই আইনের ন্যূনতম রক্ষাকবচগুলিরও যথাযথ প্রয়োগ ঘটছে না এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে । তাই সার্বিক আলোচনা থেকে বলাই যায় , এই 'সন্ত্রাস-বিরোধী' আইন দুটির ফলে প্রচলিত আইনে যেগুলি অপরাধ , যেমন — পুলিশী ক্ষমতার অপব্যবহার , বন্দীর ওপর নির্যাতন ইত্যাদি — সেগুলিও আইনের মর্যাদাভুক্ত হচ্ছে ।